করোনা পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতেশিক্ষার্থীদের সরকারের সহায়তা প্রদান

ইমদাদ ইসলাম

যারা দেশ-কাল সম্পর্কে সচেতন, তাঁদের নিশ্চয়ই আর আঁচ করতে বাকি নেই যে, চলমান করোনাকালেই শুধু থমকে নেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বরং করোনা পরবর্তী সময়ে আরো কঠিন সময় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেরই আশঙ্কা, করোনা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ফের চালু হলেও, দেশে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার নিকট অতীতের যেকোনো সময়কে ছাপিয়ে যাবে। অনেক শিক্ষাবিধদের ধারণা যে, করোনা-পরবর্তী সময়ে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ফিরবে না। অর্থাৎ গড়ে দেশের প্রতি পাঁচজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন বিদ্যালয়ে তাদের শেষ ক্লাসটি করে ফেলেছে।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন মোড়ক লাগার পেছনে প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক মন্দা। করোনার প্রাদুর্ভাবে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ফলে অর্থনৈতিকভাবেও তারা হয়ে পড়েছে ভঙ্গুর। করোনা -পরবর্তী সময়ে আরো অনেকেই চাকুরি হারাবে, বন্ধ হয়ে যাবে তাদের আয়ের পথ। এমতাবস্থায় অনেক বাবা -মায়ের পক্ষেই আর সন্তানকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হবে না।

বিশেষত দিন মজুর কিং বা স্বল্প আয়ের মা -বাবারা চাইবে, বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটে তাদের সন্তানরাও যেন স্কু লে যাওয়ার পরবর্তীতে কোনো কাজ শুরু করে, নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে এবং সংসার চালাতেও কিছুটা অবদান রাখবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই আসন্ন বিপদের মাত্রাকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে পারে যে জিনিসটি তা হলো মিড ডে মিল। করোনা পরবর্তী সময়ে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার যতটা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বাস্তবে তার চেয়ে অনেকটাই হয়তো কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল নয়টি দেশের একটি। এ দেশের প্রতিটি নাগরিক সাংবিধানিকভাবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ভোগের সমান অধিকারী (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫), একই পদ্ধতির সমমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭)। রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে জনগণের পুষ্টি ও জনজীবনের উন্নতি সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮)। যে কোনো দেশের মূল ভিত্তি হলো শিক্ষিত সমাজ। দেশবাসী শিক্ষিত না হলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষার মূল বাধা হলো দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব। দারিদ্র্যে র কারণে মা-বাবা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। তারা মনে করে শিক্ষা গ্রহণের থেকে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করা ভালো। এধরনের মনোভাবের কারণে অনেক মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছাত্র - ছাত্রী শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে , যা আমাদের দেশের জন্য অমঙ্গল। টেকসই উন্নয়ন ২০৩০- এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ বদলাবে দেশের অর্থনীতি, দারিদ্র্য মুক্ত হবে বাংলাদেশ। সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি- এ চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তর ভিত্তি করে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ। ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠন এবং উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করতে বর্তমান প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিশুদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি , মানসিক বিকাশ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের এসকল চাহিদা পূরণ ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্কুল মিল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে ২০১১ সাল থেকে শুরু করে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, যা বর্তমানে দেশের ১০৪ টি উপজেলায় বাস্তবায়িতি হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৩২.৩১ লাখ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্কুল মিল কর্মসূচিকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে শিক্ষায় সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন, শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা এবং শিখনফল অর্জন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখা সম্ভব। এ জন্য স্কুল মিল কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রাক -প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দেশের সকল শিশুকে স্বল্পত ম সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্কুল মিল নীতির আওতায় এনে তাদের শিক্ষা, পুষ্টি,স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় যথা অবদান রাখা; এই কার্যক্রম শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিসহ গ্রাম ও শহর, ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে শিক্ষার মানের পার্থক্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। শিশুদের সাময়িক ক্ষুধা নিবারণ ও পুষ্টি সহায়তার স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষার্থীদের মেধার উৎকর্ষ সাধন , চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ , সৃজনশীলতা ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক তাদের দক্ষ , যোগ্য ও মানবসম্পদে পরিণত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। দেশের প্রাক -প্রাথমিক ও প্রাথমি ক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি , উপস্থিতির হার বৃদ্ধি , পাঠে মনোনিবেশ ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ,নিরাপদ খাবার পরিবেশন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য -নিরাপত্তার প্রমিত মান তৈরি ও প্রয়োগ করা , স্কুল চলাকালে শিক্ষার্থীর ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্য মে শিক্ষা -শিক্ষক সংযোগ সময় বৃদ্ধি করা, যাতে শিক্ষার্থীরা অধিক সময় বিদ্যালয়ে ক্ষুধামুক্ত প্রাণবন্ত অবস্থায় নিরাময় ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে।স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে বিশেষ করে মায়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেশীয় মূল্যবোধ ও খাদ্য -সংস্কৃতি সংরক্ষণপূর্বক স্কুল সময়ে শিশুর পুষ্টিচাহিদা পূরণ এবং স্বাস্থ্যবান , সবল, সক্ষম, মেধাবী জনবল তৈরির মজবুত ভিত্তি গঠন করে। এই নীতিতে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী শিশুসহ) সকল শিশুকে পর্যায়ক্রমে কর্মসূচি র আওতায় আনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অবস্থানের সময় অনুসারে প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষপে গ্রহণ করছে ।

স্কুল মিল এর সুফল পাওয়ায় বরগুনা জেলার বামনা, জামালপুরের ইসলামপুর, এবং বান্দরবানের লামা উপজেলায় ডব্লিউএফপির সহযোগিতায় ২০১৩ সাল থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে মিড- ডে মিল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে ১৬ টি উপজেলায় স্কুল মিল (মিড-ডে মিল) কার্যক্রম চালু আছে। ২০২১ সালে ২৫০ টি উপজেলায় ৬৫ হাজার ৬২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। ২০২২ সালে আরে ১০০ টি উপজেলা যুক্ত করে মোট ৩৫০ টি উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। মিড -ডে মিল হিসেবে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তিন দিন রান্না করা খাবার এবং তিন দিন বিস্কুট সরবরাহ করা হবে। মন্ত্রণালয় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতায় করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার প্রেক্ষিতে ১০৪ টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২৫ থেকে ৫০ প্যাকেট বিস্কুট বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মিড-ডে মিলের জন্য মজুদ চাল, ডাল বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে ১৬ টি উপজেলায় মোট ২ হাজার ২৫৬ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে মিড-ডে মিল সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারি এই কার্যক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল চলাকালে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর , দিনাজপুরের ফুলবাড়ি , পাবনার বেড়া , নওগাঁ জেলার পোরশা , গাইবান্ধার সাঘাটা , শেরপুরের নালিতাবাড়ী , জামালপুরের ইসলামপুর , পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া ও কাউখালী , গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া , যশোরের ঝিকরগাছা , খুলনার বটিয়াঘাটা , বরগুনার বামনা, লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলা। স্কুল মিল কর্মসূচির আওতায় উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী। খাদ্যঘাটতি এলাকাসহ আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর (যেমন- দুর্গম চর, হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, চা-বাগানসহ সকল পিছিয়ে পড়া) এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃর্ক গঠিত কারিগরি কমিটির পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত স্কুল মিল কর্মসূচির জন্য ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদাসমূহ নিশ্চিত করা হয় , প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার (ক্যালরি) ন্যূনতম ৩০% স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হয় , যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩-১২ বছর বয়সি ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্ধ -দিবস স্কুলের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রয়োজনীয় পুষ্টি -চাহিদার (micronutrient requirements) ন্যূনতম ৫০% স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা (Bangladesh Desirable Dietary Guidelines) অনুযায়ী দৈনিক প্রয়োজনীয় শক্তির ১০-১৫% প্রোটিন থেকে এবং ১৫-৩০% চর্বি থেকে আসা নিশ্চিত করা হয়। তবে স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ ১০%-এর চেয়ে কম রাখ হয়।

বাংলাদেশে স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাগ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নি র্ধারিত কার্যপ্রণালী অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্ত র এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের জন্য সরকারের সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত দেশ গঠনের পাশাপাশি একটি উন্নত জাতিও গঠন করা। আর উন্নত জাতি গঠন করার জন্য মেধা -মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমন্বয় প্রয়োজন। বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নতজাতি গঠনে মানুষের আত্মিক উন্নয়ন প্রয়োজন। বস্তুগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত দেশ গঠন করা সম্ভব যেমন সুরম্য অট্টালিকা , সেতু, নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ , ফ্লাইওভার ইত্যাদি। আর উন্নত জাতি গঠন করতে হবে মেধা , মনন, মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। বিগত একদশকে সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টার ফলে দিনবদল হয়েছে জীবনমানের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু জাতি গঠনে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে এটা একদিনে এবং সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাধ্যমে আগামী দিনের ভবিষ্যত আমাদের শিশুদের টার্গেট করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ অর্জন করা সম্ভব হবে।

#

১৯.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার